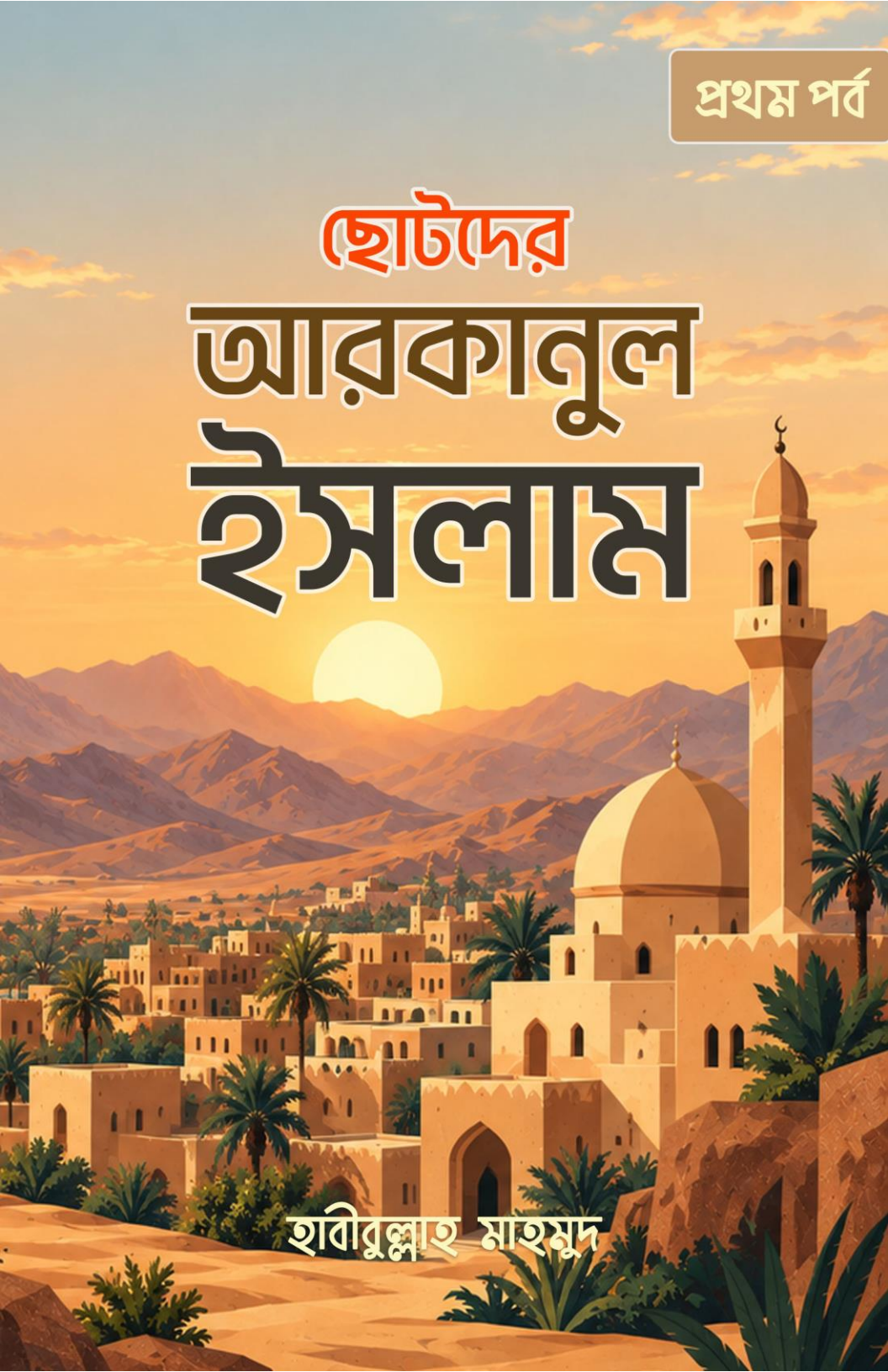
প্রথম পর্ব

ছোটদের আরকানুল ইসলাম



হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

ছোটদের
আরকানুল
ইসলাম

[প্রথম পর্ব]

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

শেষ্টিম
প্রকাশনী

ছোটদের আরকানুল ইসলাম

লেখক : হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদক : জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব : অন্তিম প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ২৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
০৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঈসায়ী

প্রকাশনায় : অন্তিম প্রকাশনী

নির্ধারিত মূল্য : ৬০ (ষাট) টাকা।

ওয়েবসাইট : https://gazwatulhind.com
https://gazwatulhind.site

কাফেলা : https://linktr.ee/kafela_official

যোগাযোগ : backup.2024@hotmail.com

অন্যান্য বইগুলো : https://cutt.ly/kafelabooks
https://dl.gazwatulhind.com
https://dl.gazwatulhind.site

বই কিনুন : https://fb.com/OntimProkashoni

ARKANUL ISLAM 1st PART WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st PUBLISHED ON: SEPTEMBER 2026 ISAYI, RABI AL-AWWAL 1446 AH HIJRI.

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সম্পাদকের কথা	০৫
লেখক পরিচিতি	০৬
ভূমিকা	০৭
আরকানুল ইসলাম	০৮
আরকানুল ইসলাম কি?	০৮
ইসলামের আরকান কয়টি ও কি কি?	০৮
শাহাদাহ	০৮
ছলাত	০৯
যাকাত	০৯
হাজ্জ	০৯
রমজান মাসের ছিয়াম	০৯
উপরের পাঠ থেকে যা শিখলাম	০৯
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) এর ঘটনা	১০
আব্দুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘটনা থেকে যা শিখলাম	১২
পাঁচটি খুঁটি বা ভিত্তির আরবি নাম ও নামের অর্থ	১৩
ঈমান কাকে বলে?	১৪
মুনাফিক কাকে বল?	১৪
পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতের নাম ও ওয়াক্ত	১৪
আল্লাহর রছূল (ﷺ) এর নেতৃত্বে মক্কা বিজয়	১৫
ঘটনা থেকে যা শিখলাম	১৬
রানী আছিয়ার (আলাইহাস সালাম) অটল ঈমান	১৭
গল্প থেকে যা শিখলাম	১৯
শাহাদাত	১৯
আল্লাহ ও তাঁর রছূল (ﷺ) এর মধ্যকার সম্পর্ক	২০
ঈমানদার কাকে বলে?	২২
ঈমানের খুঁটি বা ভিত্তি	২২
যা শিখলাম	২৩
উমর ইবনে খত্তাবের পরিচয়	২৪
যা শিখলাম	২৬
ঈমানের শাখা	২৭
যা শিখলাম	২৮

কবিরা গুনাহ	২৯
আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর পরিচয়	৩০
যা শিখলাম	৩২
তার মায়ের ইসলাম গ্রহণ	৩২
যা শিখলাম	৩৩
সাধারণ জ্ঞান	৩৪

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাহমাদুহূ ওয়া নুছল্লী ‘আলা রছূলিহিল কারীম, আম্মা বা’দ;

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই মহান দ্বীনের ভিত্তি যে কয়েকটি মৌলিক স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোকেই বলা হয় আরকানুল ইসলাম বা ইসলামের স্তম্ভসমূহ। একজন মুসলমানের ঈমান, আমল ও চরিত্র গঠনে এসব স্তম্ভের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত এই ছোট্ট বইটিতে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ- কালিমা তথা শাহাদাহ, সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে শিশু-কিশোর ও সাধারণ পাঠকদের জন্য বিষয়গুলোকে বোধগম্য ও প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আশা করি, এই বই পাঠের মাধ্যমে পাঠক ইসলামের মৌলিক বিধান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়নের প্রতি আরও আগ্রহী হবে। আল্লাহ তাআলা এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং সকলের জন্য উপকারী করে দিন, আমীন।

- সম্পাদক

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ‘‘হাবীবুল্লাহ মাহমুদ’’ নামে চেনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্মঃ তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নামঃ

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে ‘বদরী কাফেলা’ নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম"

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। যিনি আমাদের প্রতিপালক ও হুকুম দাতা। ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা ও আল্লাহর প্রেরিত রছূল মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতি।

জ্ঞান অর্জনের প্রথম ধাপ হলো নিজের দ্বীনকে সঠিকভাবে জানা। তাই ইসলামের যে ভিত্তির উপর একজন মুসলমানের জীবন গড়ে ওঠে, সেই মৌলিক বিষয়গুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরার প্রয়াস থেকেই "আরকানুল ইসলাম" বইটির সূচনা। বইটি মূলত শিশু-কিশোরদের জন্য উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। তবে ইসলাম না জানা, ইসলামে নতুন দাখিল হতে যাওয়া সহ সকল শ্রেণির পাঠকের জন্যই বইটি উপযোগী হবে ইংশা আল্লাহ।

আজকের ব্যস্ত সময়ে অনেকেই ইসলামের স্তম্ভসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভরযোগ্য ধারণা খোঁজেন। সে প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে বইটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে পাঠক অল্প সময়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারেন।

অতঃপর, বইটিতে বানান বা অর্থগত কোন ভুল পেলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং মন্তব্য দিয়ে অবগত করবেন; তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব, ইংশা আল্লাহ।

নিবেদক
হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

আরকানুল ইসলাম

আরকানুল ইসলাম কি?

আরকানুল ইসলাম (أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ) একটি আরবি শব্দ। যার অর্থ ইসলামের খুঁটিসমূহ। আরকান শব্দটি বহুবচন। যার একবচন হলো রুকন। যার অর্থ খুঁটি বা মূল ভিত্তি।

ইসলামের আরকান কয়টি ও কি কি?

আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- ইসলামের আরকান পাঁচটি।

১। শাহাদাহ

২। ছলাত

৩। যাকাত

৪। হাজ্জ

৫। রমজান মাসের ছিয়াম

শাহাদাহ

শাহাদাহ : শাহাদাহ মানে হলো ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া। কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ঈমানের সাক্ষী দিতে হয়। তাহলে তাকে ঈমানদার, মুমিন ও মুসলিম বলা হয়।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

কালেমায় শাহাদাতের অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। এবং আরো সাক্ষী দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বান্দা ও রছূল।

ছলাত

ছলাত : ছলাত মানে নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর কাছে দুয়া করা।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত আদায় করতে হয়। কেননা বান্দার উপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত ফরজ করে দিয়েছেন।

যাকাত

যাকাত : যাকাত মানে হলো বান্দার নির্দিষ্ট অর্থ সম্পদের উপর প্রতি বছর একবার একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ সম্পদ গরীব, এতিম, মুজাহিদ এমন আট শ্রেণীর মানুষের জন্য দান করা, যা বান্দার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ করে দিয়েছেন।

হাজ্জ

হাজ্জ : হাজ্জ মানে জীবনে একবার হলেও নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ সম্পদের মালিক হলে মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহতে ছফর করা। কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমানের অর্থ সম্পদের মালিক হলে তার প্রতি হাজ্জ করা আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ করে দিয়েছেন।

রমজান মাসের ছিয়াম

রমজান মাসের ছিয়াম: রমজান মাসের ছিয়াম মানে হলো প্রতি বছরের এক মাস অর্থাৎ রমজান মাসে ছিয়াম পালন করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের জন্য রমজানের এক মাস ছিয়াম পালন করা ফরজ করে দিয়েছে।

উপরের পাঠ থেকে যা শিখলাম

১। আরকানুল ইসলাম মানে ইসলামের খুঁটি বা ভিত্তি সমূহ।

২। ইসলামের খুঁটি বা ভিত্তি সমূহ পাঁচটি।

ক। শাহাদাহ
খ। ছলাত

গ। যাকাত

ঘ। হাজ্জ

ঙ। রমজান মাসের ছিয়াম

৩। কালেমা শাহাদাহ পাঠ করে আল্লাহ ও তাঁর রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য দিলে তবেই তাকে মুমিন বা মুসলিম বলা হয়।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিশ্বাস করে না, সে ব্যক্তি অমুসলিম ও কাফের।

৫। ঈমানের সাক্ষ্য শুধু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে বললেই হয় না; তাকে আমল বা কর্মও করতে হয়। আর কর্ম তিন ভাবে সম্পাদন করতে হবে। যথা-

ক। শারীরিক কষ্ট করে।

খ। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ দান করে।

গ। আত্মিক কষ্ট করে।

শারীরিক কষ্টের মানে হলো ছলাত। অর্থ সম্পদ আল্লাহর পথে দান হলো যাকাত, হাজ্জ ও ছদাকা। আত্মার কষ্টের জন্য হলো রমজান মাসের এক মাস সিয়াম পালন করা।

৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ও ছাত্র ছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) এর ঘটনা

নাম আব্দুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু), পিতার নাম উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু), জননীর নাম জয়নব (রদিয়াল্লাহু আনহা)। আব্দুল্লাহ এর পিতা মাতা দুজনেই আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী ছিলেন। এবং আব্দুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিজেও আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একজন সাহাবী ছিলেন। তার জন্ম আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছর।

ছোট আব্দুল্লাহ মদিনায় হিজরত করার পরেই বদর যুদ্ধের সাক্ষী হলেন। তখন তার বয়স মাত্র ১৩ বছর। কিন্তু তার বয়স ১৩ বছর হলে কি হবে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের হামলা দেখে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলো না। চলে গেলেন সর্বশ্রেষ্ঠ উস্তাদ এবং প্রাণের নাবী মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতির জন্য।

কিন্তু না, আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন বড়দের নাবী ছিলেন, তেমনি ছোটদেরও নাবী ছিলেন। কোমলমতি শিশুদের প্রতি তার স্নেহ ও ভালবাসা ছিল অফুরন্ত। তাই তিনি আব্দুল্লাহ কে অনেক ছোট দেখে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিলেন না।

ছোট আব্দুল্লাহ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি না পেয়ে নিজ গৃহে ফিরে যায়। আর জমা করতে থাকে নিজের মনে মুসলিমদের উপর মুশরিকদের দেওয়া নানাবিধ নির্যাতনের ঘটনা। একটি বছর পার হতেই আবার শুরু হলো আরেকটি যুদ্ধের সূচনা। যা ইতিহাসে উহুদ যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এবারো আব্দুল্লাহ আবেদন করলেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য। কিন্তু প্রিয় নাবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহকে এখনো ছোটই দেখলেন। কেবল তার বয়স ১৪ বছর। তার এখনো সময় হয়নি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের।

এবার উহুদ যুদ্ধের ২ বছর পর; বয়সের দুর্বলতা তার শেষ; যুদ্ধের সময় ঘরে বসে থাকতে আর প্রস্তুত নয় আব্দুল্লাহ। শুরু হলো খন্দক যুদ্ধ। তারুণ্যের তারুণ্যতা দেখানোর সুযোগ এসেছে আব্দুল্লাহর, আব্দুল্লাহ আর পিছনে থাকলো না খন্দকে, খায়বার, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধেও। হুনাইন যুদ্ধ, তায়েফ অবরোধ, আর তাবুক যুদ্ধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন আব্দুল্লাহ।

আব্দুল্লাহ যেমন যুদ্ধে পারদর্শী ছিলো ঠিক তেমনি জ্ঞান অর্জনেও ছিল খুবই বিচক্ষণ। তিনি প্রায় সময়ই বিশিষ্ট সাহাবীদের সঙ্গে আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মজলিসে শরিক হতেন।

একবার রছূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিচের আয়াত তিলাওয়াত করলেন- ''তুমি কি লক্ষ্য করো না, আল্লাহ তা'য়ালা কালিমা তাইয়্যেবার

কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন? তা এক পবিত্র বৃক্ষের মতো। আর তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে বিস্তৃত, সে তার রবের আদেশে অহরহ ফল প্রদান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করেন যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।" (সূরাহ ইব্রাহীম, আয়াত ২৪-২৫)

আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরপর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আয়াতের উল্লেখিত গাছ কোনটি যা মুসলমানদের মতো পবিত্র, যার পাতা কখনো ঝরে পড়ে না, যা সব সময় ফল প্রদান করে? তখন কোন সাহাবীই এর উত্তর দিতে পারছিলেন না, এমন কি আবু বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ও উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) দিতে পারলেন না।

কিন্তু মসলিসে উপস্থিত ছোট সাহাবী আব্দুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) জানতেন যে এটি খেজুর গাছ, তবে বড় বড় সাহাবীদের উপস্থিতির কারণে সে লজ্জায় তা মুখে বলতে পারলো না।

মজলিস শেষ হলে সে তার পিতা উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) কে বিষয়টি জানায়, যা শুনে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তার ছেলের এই গভীর জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত হন।

এই ঘটনাটিই প্রমাণ করে যে, আব্দুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) অল্প বয়স থেকেই কতটা বিচক্ষণ, জ্ঞানী এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

আব্দুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘটনা থেকে যা শিখলাম

১। সাহাবী শব্দটি একবচন। এর অর্থ একজন সঙ্গী বা সহচর। আর সাহাবা শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অনেক সঙ্গী বা সহচর।

২। সাহাবী হলেন সেই সম্মানিত ব্যক্তি, যিনি নাবী মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তার জীবদ্দশায় তার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং ইসলামের ওপরেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

৩। আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সকল সাহাবীদের অনেক ভালোবাসতেন। হোক সে ছোট অথবা বড়।

৪। মুসলিমদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে অগাধ ভালোবাসা থাকতে হবে।

৫। মুসলিমদের ওপর মুশরিকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

৬। অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে মুসলিমদের আমির বা নেতাকে সাহায্য করতে হবে।

৭। একজন সাহসী বীর যোদ্ধা হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার স্বপ্ন অন্তরে লালন করতে হবে।

৮। ইলম অর্জনের জন্যও পরিশ্রম করতে হবে।

৯। আল্লাহ প্রদত্ত আমির বা ইমামগনের মজলিসকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং উপস্থিত থাকতে হবে।

১০। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

পাঁচটি খুঁটি বা ভিত্তির আরবি নাম ও নামের অর্থ

ক্রমিক নং	আরবি নাম	নামের অর্থ
১	শাহাদাহ	ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া
২	ছলাত	নির্দিষ্ট নিয়মে দুয়া করা
৩	যাকাত	সম্পদ বিশুদ্ধ করা ও পবিত্র করা
৪	হাজ্জ	বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা
৫	ছিয়াম	ফজর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা।

ঈমান কাকে বলে?

অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কাজে বাস্তবায়ন করাকে ঈমান বলে।

মুনাফিক কাকে বল?

যে মুখে ঈমানের স্বীকারোক্তি দেয় কিন্তু কাজে বাস্তবায়ন করে না এবং অন্তরে বিশ্বাস করে না তাকে মুনাফিক বলে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতের নাম ও ওয়াক্ত

ক্রমিক নং	নাম	ওয়াক্ত
১	ফজর	ভোর বেলায় দিনের শুরুতে পড়তে হয়।
২	যোহর	দুপুর বেলায় দিনের মধ্য ভাগে পড়তে হয়।
৩	আছর	বিকেল বেলায় দিনের শেষ ভাগে পড়তে হয়।
৪	মাগরিব	সাজ বেলায় রাতের শুরুর ভাগে পড়তে হয়।
৫	ইশা	রাতের বেলায় রাতের প্রথম ভাগে পড়তে হয়।

আল্লাহর রছূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নেতৃত্বে মক্কা বিজয়

অনেক বছর আগের কথা। আমাদের প্রিয় নাবী (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত ও রিসালাত প্রাপ্ত হলেন। তখন মক্কার মানুষ বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত ছিলো।

আল্লাহর আদেশে রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সকল মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আহ্বান করতে শুরু করলেন। তার আহ্বানে প্রথম খুব কম মানুষই সাড়া দিল।

অন্যদিকে মক্কার অধিকাংশ লোক; বিশেষ করে ধনী শ্রেণী ও সমাজের অধিপতি বা নেতাগণ খুব কঠোরভাবে নবী (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধিতা করতে শুরু করে। বিভিন্ন ভাবে তারা আমাদের প্রিয় নাবী (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সঙ্গীদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করে।

এক সময় অত্যাচার এত বেড়ে গেল যে, নাবীজি (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার বন্ধুদের প্রিয় শহর মক্কা ছেড়ে ঘরবাড়ি ফেলে মদিনা শহরে চলে যেতে হয়। এই চলে যাওয়াকে হিজরত বলা হয়।

মদিনায় যাওয়ার পরে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কিছুটা শক্তিশালী করলেন। অনেক লোক তার সাথে যুক্ত হলেন। এরপর একে একে মক্কার কাফের, মুশরিক ও তাদের মিত্রদের সাথে মুসলিমদের অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এ সকল যুদ্ধে আল্লাহ মুসলিমদের বিজয়ী করে, তাদের বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করেন।

নাবীজি (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখন অনেক শক্তিশালী। আল্লাহ তাকে অনেক বড় এক বাহিনী দিয়েছেন। অষ্টম হিজরী রমজান মাসে রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১০,০০০ বীর মুসলিম সৈন্য নিয়ে মক্কার দিকে রওনা দেন এবং বিনা বাঁধায় কোন রক্তপাত ছাড়াই মক্কা বিজয় করেন।

তখন মক্কার সেই অত্যাচারী কাফের ও মুশরিকরা ভয়ে কাঁপছিল। তারা ভাবছিল আজ সবাইকে মেরে ফেলবে। কিন্তু নাবী (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন প্রতিশোধ নিলেন না। নাবী (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘হে কুরাইশরা! তোমরা আজ আমার কাছ থেকে কেমন ব্যবহার আশা করো?’’

তারা নিচু গলায় বলল, "আপনি আমাদের দয়ালু ভাই এবং দয়ালু ভাইয়ের ছেলে। আমরা আপনার কাছ থেকে ভালো আচরণই আশা করি।"

তখন রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তাহলে তোমরা চলে যাও, তোমরা সবাই আজ মুক্ত। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।" কুরাইশরা তার এই মহানুভবতা দেখে অধিকাংশই মুসলিম হয়ে গেল।

শত্রুর উপর জয়ী হয়েও এমন ক্ষমা করার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এটি পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষমা ও উদারতার সব থেকে বড় উদাহরণ।

ঘটনা থেকে যা শিখলাম

১। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ নাবীদের যে বিশেষ দায়িত্ব ও সম্মান প্রদান করেন তাকে নবুয়াত বলে।

২। আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন কোন কিতাব বা জীবনবিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলে।

৩। মক্কার ধনী শ্রেণী ও নেতাগণ আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সব থেকে কঠোর বিরোধিতা করে।

৪। নাবী (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মভূমি ও মাতৃভূমির নাম ছিল মক্কা।

৫। প্রথম সময়ে সত্যের পথে খুব কম মানুষই রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ডাকে সাড়া দেন।

৬। রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সঙ্গীরা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন।

৭। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, নিজের ঈমান ও ধর্ম রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিজের মাতৃভূমি, বাড়িঘর ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়াকে হিজরত বলে।

৮। অষ্টম হিজরী রমজান মাসে আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশ হাজার সৈনিক নিয়ে বিনা বাঁধায় রক্তপাত ছাড়াই মক্কা বিজয় করেন।

১০। অনেক বড় সাফল্য বা বিজয় পেলেও কখনো অহংকার করা যাবে না, সর্বদা বিনয়ী থাকতে হবে।

১১। শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলে অনেক সময় শত্রুর মন গলে যায় এবং সে ভালো মানুষে পরিণত হয়।

১২। মক্কা বিজয় রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বীরত্ব, ধৈর্য, ক্ষমা ও মহানুভবতার প্রতীক।

রানী আছিয়ার (আলাইহাস সালাম) অটল ঈমান

মূসা (আলাইহিস সালাম) এর সময়ের ঘটনা। আছিয়া (আলাইহাস সালাম) ছিলেন মিশরের রানী এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী রাজা ফিরাউনের স্ত্রী। ফিরাউন নিজেকে আল্লাহ দাবি করত। প্রাসাদে আছিয়া (আলাইহাস সালাম) এর ধন-সম্পদ, গহনা, দাস-দাসী আর সম্মান কোন কিছুর অভাব ছিল না।

এত সুখের মাঝেও তার অন্তরে ছিল এক আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা। তিনি মনে মনে মূসা (আলাইহিস সালাম) এর আনীত সত্য দ্বীন ও এক আল্লাহকে বিশ্বাস করতেন।

একদিন ফিরাউন জানতে পারলো যে, তার নিজের ঘরের রানী আছিয়া-ই (আলাইহাস সালাম) তাকে রব হিসাবে মানে না। এই কথা শুনে অহংকারী ফিরাউন খুব রেগে গেল।

সে আছিয়াকে বলল, "তুমি যদি এক আল্লাহকে বিশ্বাস করা ছেড়ে না দাও, তবে আমি তোমার সব রাজকীয় সুখ কেড়ে নেব এবং তোমাকে এমন শাস্তি দেব যা কেউ কখনো দেখেনি!"

কিন্তু আছিয়া (আলাইহাস সালাম) ফিরাউনের এত বড় ক্ষমতা বা শাস্তির ভয়কে বিন্দুমাত্র পরোয়া করলেন না। তিনি বললেন, "আমি শুধু এক আল্লাহকেই বিশ্বাস করি।"

ফিরাউন তখন তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করল। মরুভূমির তপ্ত বালির উপর শুইয়ে তার হাত-পায়ে লোহার পেরেক ঠুকে দেওয়া হলো। যেন তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। উত্তপ্ত রোদে তার বুকের ওপর ভারি পাথর রেখে দেওয়া হলো।

কিন্তু এত কষ্টের মাঝেও আছিয়া (আলাইহাস সালাম) এর মুখ থেকে হাসির আভা মুছে যায়নি, তার বিশ্বাস (ঈমান) একটুও কমেনি।

মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে, প্রচণ্ড কষ্টের মাঝেও তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর কাছে একটি ছোট্ট দোয়া করেছিলেন, যা পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তুলে ধরেছেন,

"হে আমার রব! আমার জন্য আপনার নিকটে জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করুন এবং আমাকে ফিরাউন ও তার মন্দ কাজ থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।" (সূরা তাহরীম, আয়াত ১১)

আল্লাহ তার এই গভীর ঈমান দেখে এত খুশি হলেন যে, তিনি আছিয়ার (আলাইহাস সালাম) মৃত্যুর আগেই তার চোখের সামনে থেকে দুনিয়ার পর্দা সরিয়ে জান্নাতে তার জন্য তৈরি করা সুন্দর বাড়িটি দেখিয়ে দিলেন।

জান্নাতের সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে রানী আছিয়া (আলাইহাস সালাম) হাসিমুখে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আমাদের নাবী (ﷺ) বলেছেন, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ৪ জন নারীর একজন হলেন এই আছিয়া (আলাইহাস সালাম)।

গল্প থেকে যা শিখলাম

১। ঈমান বা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হলো দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

২। বিপদের সময় মানুষের কাছে সাহায্য না চেয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে ও দোয়া করতে হবে।

৩। বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে ও আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে হবে।

৪। সব সময় মনে রাখতে হবে আসল সুখ জান্নাতে।

৫। পৃথিবীর সকল মানুষ ভুল পথে থাকলেও আমাকে সত্য সঠিক পথে থাকতে হবে।

৬। আল্লাহর উপর ভরসা রাখার পাশাপাশি নিজের মনে সাহস রাখতে হবে।

৭। মনে রাখতে হবে কষ্টের পরেই আসে স্বস্তি বা সুখ।

৮। আমরা যদি দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করি, তাহলে জান্নাতে তিনি আমাদের এর থেকে অনেক দামি ও উত্তম জিনিস উপহার দিবেন।

শাহাদাত

শাহাদাত শব্দের অর্থ সাক্ষ্য প্রদান করা। অমুসলিম থেকে মুসলিম হতে হলে সর্বপ্রথম তাকে ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। একজন মুসলিম ও অমুসলিমের প্রথম পার্থক্য হল- মুসলমানগণ আনন্দচিত্তে অন্তর থেকে ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করে। আর অমুসলিমরা ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করে না।

ঈমানের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য মুসলিমগণ যে বাক্য পাঠ করে তাকে কালিমায়ে শাহাদাত বলে।

কালিমা শব্দের অর্থ বাক্য। আর শাহাদাত শব্দের অর্থ সাক্ষ্য প্রদান করা। অর্থাৎ কালিমায়ে শাহাদাত অর্থ ঈমানের সাক্ষ্য প্রদানের বাক্য বলা।

কালিমায়ে শাহাদাত বা ঈমানের সাক্ষ্য প্রদানের বাক্য হল-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থাৎ কালেমা শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে দুইটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা যায়।

১) মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি।

২) আল্লাহর রছূল মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি।

যে ব্যক্তি ঈমান আনবে সেই ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রছূল। যদি কোন ব্যক্তি এই দুটি বিষয়ের কোন একটি বিষয়ের সাক্ষ্যপ্রদান না করে তবে সে ব্যক্তি অমুসলিম এবং কাফের।

কাজেই যতদিন আমরা এই দুইটা বিষয়ে অন্তর থেকে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করব ততদিন আমরা নিজেকে একজন ঈমানদার বা মুমিন বান্দা বা বান্দী হিসেবে গণ্য করতে পারবো।

আল্লাহ ও তাঁর রছূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যকার সম্পর্ক

আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন উন্নত চরিত্রের এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যের একজন মানুষ।

জাহিলিয়াত মানে অন্ধকার বা পাপাচারে পরিপূর্ণ যুগ। সেই যুগে মানুষকে পাপাচার থেকে মুক্ত করার জন্য, অন্ধকার থেকে আলোকিত করার জন্য, অসভ্য মানুষকে সভ্যতা শেখানোর জন্য আরবের মক্কা নগরীতে মহান আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর প্রতিনিধি হিসেবে মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রছূল হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুগ্রহে নিজের চরিত্রকে অধিক থেকে অধিক উন্নত চরিত্রে এবং নিজের বৈশিষ্ট্যকে অধিক থেকে অধিক উন্নত করেছিলেন এবং নিজেকে একজন উত্তম মানুষ হিসেবে গঠন করেছিলেন।

সেই সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত শুধুমাত্র তিনি এই উন্নত চরিত্র ও সর্বোত্তম আদর্শের মানুষ হিসেবে সবার কাছে পরিচিত।

তাই শুধুমাত্র তারই আদর্শই আমাদেরকে অনুসরণ করে চলতে হবে। তিনি আল্লাহর গোলামী বা দাসত্বে নিজেকে সকল অবস্থায় রাখতেন। তিনি মহান আল্লাহর যে গোলামী বা দাসত্ব করতেন সেটাই আল্লাহর জন্য ইবাদত।

যে ব্যক্তি ইবাদত, গোলামী বা দাসত্ব করে তাকে আরবিতে আব্দ বলা হয় যার অর্থ দাস, গোলাম বা বান্দা। আর যার উদ্দেশ্যে ইবাদত, গোলামী বা দাসত্ব করা হয় তাকে আরবিতে মাবুদ বলা হয়।

অর্থাৎ মাবুদ আর আব্দের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী হয় ইবাদতের মাধ্যমে। আর মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন মহান আল্লাহ তায়ালার একজন শ্রেষ্ঠ আব্দ বা গোলাম। কেননা তাঁর ইবাদত বা গোলামী ছিলো শ্রেষ্ঠ।

সুতরাং, আল্লাহ ও তাঁর রছূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মধ্যে সম্পর্ক হল- আল্লাহ মাবুদ আর মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার শ্রেষ্ঠ আব্দ। মহান আল্লাহ তায়ালা মালিক, মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার শ্রেষ্ঠ গোলাম। মহান আল্লাহ তায়ালা খালিক অর্থাৎ স্রস্টা। আর মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার শ্রেষ্ঠ মাখলুক অর্থাৎ সৃষ্টি।

মহান আল্লাহ তায়ালাই মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন, যেন তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন মহান আল্লাহ তায়ালার গোলামী বা ইবাদতের পদ্ধতি।

কাজেই আমরা আল্লাহর জন্য যেই ইবাদতই করি না কেন তা অবশ্যই হতে হবে আল্লাহর রছূল মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিখানো। তবেই আমাদের কল্যাণ, তবেই আমাদের মুক্তি। আর আমরা মুসলিম, আমরা আল্লাহ তায়ালার গোলামী আনন্দচিত্তে করি। এটাই আমাদের সম্মান, এটাই আমাদের প্রশান্তি।

ঈমানদার কাকে বলে?

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রছূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে ঈমানদার বলে।"

ঈমানের খুঁটি বা ভিত্তি

ইসলামের যেমন খুঁটি বা ভিত্তি রয়েছে। ঠিক তেমনি ঈমানেরও খুঁটি বা ভিত্তি রয়েছে। ইসলামের খুঁটি পাঁচটি যা আমরা পূর্বে পড়েছি। এখন আমরা শিখবো, ঈমানের খুঁটি বা ভিত্তি কয়টি ও কি কি?

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদিস-তার পিতা উমার ইবনু খাত্ত্বাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- একদিন আমরা রছূল এর নিকটে বসে ছিলাম। হঠাৎ এক লোক আসলো যিনি ছিলেন জিবরাঈল আঃ। তিনি মূলত মানুষের রূপ ধরে এসে মজলিসে বসে রছূলকে (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন প্রশ্ন করতেছিল। অতঃপর সে (আবার) বলল, 'আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।' রছূল উত্তরে বললেন, 'তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রছূলসমূহ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।' সে (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) বলল, 'আপনি যথার্থ বলেছেন।' (সংক্ষিপ্ত) (সহিহ মুসলিম, হা: নং: ৮)

ঈমানের খুঁটি বা ভিত্তি ৬টি-

১. আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করা।

২. আল্লাহর ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস করা যে ফেরেশতাগণ আছে এবং তারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালন করে।

৩. আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা যে সেগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে মানবজাতির কল্যাণের জন্য নাযিল হয়েছে।

৪. আল্লাহর রছূলগণের প্রতি বিশ্বাস করা যে তারা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছিলেন জাতির সংশোধন ও নাজাতের জন্য।

৫. শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখা যে মানুষ মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবে এবং আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর আদেশ মানবে

তারা জান্নাত পাবে। আর যারা আল্লাহর আদেশ মানবে না তারা জাহান্নামে যাবে।

৬. তাকদিরের উপর বিশ্বাস করা যে দুনিয়ার জীবনের এই সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, ভালো-মন্দ সকল কিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের পরীক্ষা। তবে বান্দা তার কর্ম ও দুয়ার মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু সেটাও আল্লাহর ইচ্ছায়।

যা শিখলাম

১। শাহাদাত অর্থ হলো সাক্ষ্য প্রদান করা।

২। মুসলিম হতে হলে সর্বপ্রথম ঈমানের সাক্ষ্য (কালিমায়ে শাহাদাত) পাঠ করতে হয়।

৩। কালিমায়ে শাহাদাত হলো- আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রছূল-এই সাক্ষ্য দেওয়া।

৪। মুসলিম ও অমুসলিমের প্রধান পার্থক্য হলো ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করা।

৫। আল্লাহই একমাত্র মা'বুদ (উপাস্য), তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

৬। আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা (আব্দ) ও সর্বোত্তম আদর্শ।

৭। আল্লাহ হলেন খলিক (স্রষ্টা) এবং সবকিছু তাঁর সৃষ্টি (মাখলুক)।

৮। ইবাদত মানে আল্লাহর গোলামী করা এবং তা রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শেখানো পদ্ধতিতে করতে হবে।

৯। ঈমানদার হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ ও তাঁর রছূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

১০। ঈমানের ৬টি ভিত্তি আছে- আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রছূল, আখিরাত ও তাকদিরের উপর বিশ্বাস করা।

উমর ইবনে খত্তাবের পরিচয়

তার নাম উমর। উপনাম আবু হাফস। উপাধি ফারুক। পিতার নাম খাত্তাব মায়ের নাম হান্তামা। পূর্ণ বংশ হলো, উমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে রিয়াহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুরত ইবনে রাজ্জাহ ইবনে আদি ইবনে কাব ইবনে লুআই ইবনে গালিব আল-কুরাইশি। আদির অপর ভাই মুররা। রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুররার বংশধর। এখানে এসে অষ্টম পুরুষে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর বংশ রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশের সঙ্গে মিলে যায়। জাহেলি যুগ থেকে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্মানিত। তার ঊর্ধ্বতন পুরুষ আদি আরবের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে কুরাইশের সালিশি করতেন। বিভিন্ন গোত্রের কাছে দূত হিসেবে প্রেরিত হতেন। বংশপরম্পরায় এই দায়িত্ব তাদের পরিবারেই বহাল থাকে। দাদার বংশের মতো উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর নানার বংশও ছিল অত্যন্ত সম্মানিত। তার মা হান্তামা হাশেম ইবনে মুগিরার মেয়ে ছিলেন। কুরাইশরা কোনো গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে সেনাবাহিনী দেখাশোনার দায়িত্ব তাদের হাতেই থাকত।

কুরাইশের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আবু জাহেল ও উমরই ইসলাম ও রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্রধানতম ভূমিকা পালন করতো।

তাই রছূল বিশেষভাবে তাদের উভয়ের হেদায়েতের জন্য দোয়া করেন। তিনি বলেন,

اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب

‘হে আল্লাহ! আবু জাহেল ও উমর ইবনে খাত্তাবের মধ্যে যে আপনার কাছে বেশি প্রিয়, তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।’

আল্লাহ তায়ালা তো এ সৌভাগ্য উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। তাই আবু জাহেল এ সৌভাগ্য পায় কী করে? এই দোয়ার ফলে কিছুদিন পর ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন, ইসলামের সবচেয়ে বড় বন্ধু ও প্রাণ উৎসর্গকারী হয়ে যান। অর্থাৎ উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম

গ্রহণ করেন। আর এটা তো আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান কেবল তাকেই তা দান করেন। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) কঠিন অত্যাচারের পরও এক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে খোদ রছূল কে হত্যা করার সংকল্প করেন। কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে সোজা রছূলের কাছে যাওয়া শুরু করেন। ঘটনাচক্রে পথে নুয়াইম ইবনে আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। উমরকে উত্তেজিত দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাচ্ছো? উমর রা বলেন, আমি মুহাম্মাদের ফায়সালা করতে যাচ্ছি। নুয়াইম বললেন, আগে যেয়ে নিজ ঘরের খবর নাও। তোমার বোন এবং ভগ্নিপতিই তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। উমর তৎক্ষণাৎ বোনের ঘরের দিকে হাঁটা ধরেন। বোন উমরের পায়ের আওয়াজ পেয়ে তেলাওয়াত বন্ধ করে কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো লুকিয়ে ফেলেন। কিন্তু উমর কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ পেয়ে গিয়েছিলেন। বোনকে জিজ্ঞেস করেন, কী করছিলে? বোন বলল, কিছুই না। তিনি বলেন, শুনতে পেলাম তোমরা নাকি ধর্মত্যাগী হয়ে গেছ। কথাটা বলে তিনি ভগ্নিপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। বোন বাঁচাতে এলে উমর তাকেও প্রহার শুরু করেন। এমনকি তার শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। কিন্তু নির্যাতন তাদেরকে ইসলাম থেকে সামান্যতম ফেরাতে পারেনি। বোন বলেন, উমর! যা ইচ্ছে করতে পারো। কিন্তু অন্তর থেকে ইসলাম বের করতে পারবে না। এ বাক্যটি উমরের মনে গভীর রেখাপাত করে। বোনের দিকে তিনি মমতার দৃষ্টিতে তাকান। দেখতে পান তার দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। এটা দেখে তার হৃদয় বিচলিত হয়ে ওঠে। বলেন, কী পড়ছিলে সেটা আমাকে একটু শোনাও। ফাতেমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) কুরআনের অংশগুলো সামনে এনে রাখেন। তিনি হাতে উঠিয়ে দেখেন তাতে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লেখা রয়েছে,

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'আসমান-জমিনের সবকিছু আল্লাহ তায়ালার তাসবিহ পাঠ করে।'

কুরআনের প্রতিটি শব্দ তার অন্তরকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। তিনি তেলাওয়াত করে যাচ্ছিলেন। তেলাওয়াত করতে করতে নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন,

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ তোমরা আল্লাহ এবং তার রছূল এর উপর ঈমান নিয়ে এসো। তখন উমর আপনা থেকেই বলে ওঠেন,

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রছূল।'

এটা ছিল তখনকার কথা, যখন প্রিয়নবী সাফা পাহাড়ের নিচে আরকাম (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর বাড়িতে অবস্থান করতেন। উমর প্রিয়নবীর কাছে উপস্থিত হয়ে তার দ্বারে করাঘাত করেন। উমরের হাতে তরবারি ছিল। বিধায় সাহাবিগণ তাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

হামজা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন আসতে দাও। ভালো নিয়তে এসে থাকলে ভালোকথা, অন্যথায় তার তরবারি দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করা হবে।

উমর ভেতরে পা রাখামাত্রই নবীজি (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই এগিয়ে এসে তার জামা ধরে বলেন, উমর কেন এসেছ? নবুওয়াতের প্রভাবপূর্ণ আওয়াজ উমরের দেহ মন কাঁপিয়ে দেয়। বিনয়ের সঙ্গে বলেন, ঈমান আনার জন্য এসেছি। নবীজির জবান থেকে তখন এমনিতেই এমন সজোরে তাকবির ধ্বনি বের হয়, যা গোটা পাহাড় কাঁপিয়ে তোলে। (সিয়ারুস সাহাবা, খন্ড-২, পৃঃ ১১০-১১৩)

যা শিখলাম

১। উমর ইবনে খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন কুরাইশ বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি।

২। তাঁর উপনাম ছিল আবু হাফস এবং উপাধি ছিল ফারুক (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী)।

৩। তাঁর বংশধারা নবী মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশের সাথে অষ্টম পুরুষে গিয়ে মিলিত হয়।

৪। জাহেলিয়াত যুগে তাঁর পরিবার সমাজে নেতৃত্ব ও সালিশির দায়িত্ব পালন করত।

৫। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি ইসলামের কঠোর বিরোধী ছিলেন।

৬। রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু জাহেল ও উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এই দুইজনের হেদায়েতের জন্য বিশেষ দোয়া করেছিলেন।

৭। আল্লাহ তাআলা উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দান করেন।

৮। তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণ এবং কুরআনের আয়াত তাঁর হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে।

৯। কুরআনের তিলাওয়াত শুনে তাঁর অন্তর পরিবর্তিত হয় এবং তিনি কালিমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

১০। তাঁর ইসলাম গ্রহণ মুসলিমদের জন্য শক্তি ও সাহসের বড় উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

ঈমানের শাখা

আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- "নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঈমানের ৬০ অথবা ৭০ এরও অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো- لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই) এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো- রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।

ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) ঈমানের এই শাখা গুলোকে তার 'শুয়াবুল ঈমান' কিতাবে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন।

১। আল্লাহর প্রতি।

২। রছূলগণের প্রতি।

৩। ফেরেশতাগণের প্রতি।

৪। কুরআন মাজিদের প্রতি।

৫। তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি।

৬। আখিরাতের প্রতি।

৭। পুনরুত্থানের প্রতি।

৮। হাশরের দিনের প্রতি।

৯। মুমিনের স্থান জান্নাত আর কাফেরের স্থান জাহান্নাম এ কথার প্রতি। (উপরোক্ত নয়টি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা)

১০। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা।

১১। মনে সদা আল্লাহর ভয় জাগ্রত থাকা।

১২। আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা রাখা।

১৩। আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা।

১৪। আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালোবাসা।

১৫। আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা।

যা শিখলাম

১। ঈমানের অনেকগুলো শাখা রয়েছে- ৬০ বা ৭০ এরও বেশি।

২। ঈমান শুধু মুখের কথা নয় বরং বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয়।

৩। ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হলো- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এর সাক্ষ্য প্রদান করা।

৪। ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হলো- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।

৫। আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৬। ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি) "শু’আবুল ঈমান" কিতাবে ঈমানের শাখাগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

৭। আল্লাহ, রছূল, ফেরেশতা ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৮। তাকদিরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

৯। আখিরাত, পুনরুত্থান ও হাশরের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরি।

১০। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

১১। আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখা, সুধারনা রাখা, তার প্রতি নির্ভর হওয়া ঈমানের শাখা।

কবিরা গুনাহ

কবিরা গুনাহ হচ্ছে এমন গুনাহ, যা সংঘটিত করলে তাওবাহ না করলে জাহান্নামে যেতে হবে। তবে আল্লাহ বলেছেন- তিনি শিরকের গুনাহের ক্ষেত্রে তাওবাহ না করলে চিরস্থায়ী জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন। এর নিচের গুনাহের বিষয়ে কি করবেন তা আল্লাহ নির্ধারণ করবেন। অর্থাৎ চাইলে মাফ করতেও পারেন, নাও করতে পারেন।

নিচে ১৫টি কবিরা গুনাহ বর্ণনা করা হলো-

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা।

২. অবৈধ ভাবে মানুষ হত্যা করা।

৩. যাদু করা।

৪. ছলাত ত্যাগ করা।

৫. যাকাত না দেওয়া।

৬. বিনা ওজরে রমযানের সিয়াম ভঙ্গ করা।

৭. হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা।

৮. আল্লাহ ভীরু মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।

৯. আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করা।

১০. যিনা-ব্যভিচার করা।

১১. সমকামিতা।

১২. সুদ।

১৩. ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা এবং তার উপর যুলুম করা।

১৪. মহান আল্লাহ ও তাঁর রছূল (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।

১৫. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা।

আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর পরিচয়

নাম উমায়ের। উপনাম আবু হুরাইরা। বংশধারা হলো-উমায়ের ইবনে আমের ইবনে আবদে যিশ-শারা ইবনে তুরাইফ ইবনে ইতাব ইবনে হানিয়্যা ইবনে সাদ ইবনে সা'লাবা ইবনে সুলাইম ইবনে ফাহাম ইবনে গনাম ইবনে দাউস।

তার মূল বংশীয় নাম আবদে শামস। ইসলাম গ্রহণের পর রছূল এটা পরিবর্তন করে রাখেন উমায়ের। কীভাবে তার উপনাম আবু হুরাইরা হয়েছে, তা তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, 'আমি একটি বিড়াল পালতাম। রাত হলে তাকে একটি গাছে নিয়ে রেখে দিতাম। সকালে যখন বকরি চরাতে যেতাম, তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম এবং তার সাথে খেলাধুলা করতাম। বিড়ালের সাথে আমার এই খেলা দেখে লোকে আমাকে আবু হুরাইরা বা বিড়ালের পিতা বলা শুরু করে'। তিনি দাউস গোত্রের লোক ছিলেন, যাদের আবাস ছিল ইয়ামানে। শৈশবেই তিনি বাবাকে হারিয়েছিলেন। এজন্য ছোট থেকেই ক্ষুধা-দারিদ্র্য তার সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। রুটি ও পোশাকের বিনিময়ে বুসরা বিনতে গাজওয়ানের চাকরি করতেন। তার দায়িত্ব ছিল, যখন বুসরা কোথাও যেতেন, তখন তার বাহনের সাথে খালি পায়ে তাকে দৌড়াতে হতো। ঘটনাচক্রে পরবর্তীকালে এ মহিলাই তার স্ত্রী হয়েছিল। আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু এর দাউস গোত্রেরই আরেক ব্যক্তি হলেন তোফায়েল ইবনে আমর দাউসি, যিনি হিজরতের পূর্বে মক্কায় এসে কুরআনের অলৌকিকতায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি ইয়ামানে ফিরে আসেন।

তার প্রচেষ্টাতেই দাউস গোত্রে ইসলাম প্রসার লাভ করে। ইসলাম গ্রহণকারী পরিবারগুলো নিয়ে খাইবার যুদ্ধের সময় রছূল এর নিকট মদিনায় উপস্থিত হন; কিন্তু নবীজি (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন খাইবারে অবস্থান করছিলেন, তাই তারা মদিনা থেকে খাইবারে পৌঁছান। এই আগমনকারী কাফেলায় আবু হুরাইরাও ছিলেন। রাস্তায় তিনি অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন:

يا ليلة من طولها وعنائها ... على انها من دار الكفر نجت

এই রাতের প্রহরগুলো যদিও অনেক দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য, তা সত্ত্বেও তা আমাদের কুফরির জগৎ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে খাইবার প্রান্তরে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। রাস্তায় তার একটি গোলাম হারিয়ে গিয়েছিল। খাইবারে গিয়ে গোলামটিকে দেখতে পান। রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আবু হুরাইরা! তোমার গোলাম চলে এসেছে। তিনি বলেন, ইয়া রছূলাল্লাহ! আমি একে আল্লাহর জন্য মুক্ত করে দিলাম।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এমনভাবে নবীজি (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান, নবীজি এর মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গ ছাড়েননি।

ইসলাম গ্রহণের পর কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তার থেকে বর্ণিত আছে, আমি যেসকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, খাইবার অভিযান ছাড়া তার প্রত্যেকটি থেকেই গনিমত লাভ করেছি। খাইবার থেকে গনিমত না পাওয়ার কারণ হলো, খাইবারের গনিমত হুদাইবিয়া প্রান্তরে সংঘটিত বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

যা শিখলাম

১। আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর মূল নাম ছিল উমায়ের।

২। তাঁর উপনাম "আবু হুরাইরা" (বিড়ালের পিতা) রাখা হয়, কারণ তিনি একটি বিড়াল লালন-পালন করতেন।

৩। ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল "আবদে শামস'', যা রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিবর্তন করে দেন।

৪। তিনি ইয়ামানের দাউস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৫। শৈশবেই পিতাকে হারিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছেন।

৬। জীবনের শুরুতে তিনি কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

৭। তোফায়েল ইবনে আমর দাউসি (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর দাওয়াতের মাধ্যমে তাঁর গোত্রে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।

৮। খাইবার অভিযানের সময় তিনি রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৯। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সবসময় নবীজি (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সান্নিধ্যে ছিলেন।

১০। তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং নবীজির ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের একজন ছিলেন।

তার মায়ের ইসলাম গ্রহণ

তিনি ইসলাম গ্রহণের পর চিন্তা করতে থাকেন কীভাবে বৃদ্ধ মাকে ইসলামের ছায়ায় প্রবেশ করানো যায়। যতবারই তিনি মাকে দাওয়াত দিয়েছেন, ততবারই মা অস্বীকার করেছেন। একদিন তিনি অন্যান্য দিনের মতোই তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন; কিন্তু এবার তার মা নবীজি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কিছু অশোভন কথা শুনিয়ে দেন। এতে আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) ভীষণ মর্মাহত হন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি

নবীজি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করেন। এরপর নবীজি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মায়ের জন্য দোয়া করতে বলেন। নবীজি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন। দোয়া কবুল হয়ে যায়। তার মা তখন ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) ঘরে পৌঁছলে মা তাকে ভেতরে ডাকেন এবং কালিমা পাঠ করে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা জানান দেন। আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে কাঁদতে নবীজি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে বলেন, 'ইয়া রছূলাল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার দোয়া কবুল হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা আম্মাজানকে হেদায়েত দান করেছেন।'

যা শিখলাম

১। আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে খুব আন্তরিক ছিলেন।

২। তিনি বারবার দাওয়াত দিলেও তাঁর মা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেননি।

৩। এক পর্যায়ে তাঁর মা নবীজি (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে অশোভন কথা বললে তিনি গভীরভাবে কষ্ট পান।

৪। কষ্ট পেয়ে তিনি সরাসরি আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে সাহায্য চান।

৫। তিনি নিজের জন্য নয়, বরং মায়ের হেদায়েতের জন্য দোয়া চাইতেন।

৬। আল্লাহর রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মায়ের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেন।

৭। আল্লাহ তাআলা সেই দোয়া কবুল করেন।

৮। দোয়ার বরকতে তাঁর মা ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

৯। আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বাড়ি ফিরে দেখেন, তাঁর মা কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

১০। তিনি আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে রছূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই সুসংবাদ জানান।

সাধারণ জ্ঞান

১. ইসলামের রুকন (ভিত্তি) ৫টি।

২. ইসলামের প্রথম রুকন হলো কালিমায়ে শাহাদাত।

৩. ইসলামী বছরে ১২টি মাস রয়েছে।

৪. আরবি মাস ২৯ বা ৩০ দিনে হয়।

৫. ইসলামী বছরের প্রথম মাস মুহাররম।

৬. ইসলামী বছরের শেষ মাস যিলহজ্জ।

৭. রমযান ইসলামী বছরের নবম মাস।

৮. হজ আদায় করা হয় যিলহজ্জ মাসে।

৯. কুরআনুল কারীম নাযিল শুরু হয় রমযান মাসে।

১০. লাইলাতুল কদর রমযান মাসের একটি মহিমান্বিত রাত।

১১. মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ আল্লাহর নবী ও রছূল।

১২. নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ।

১৩. নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাতার নাম আমিনা।

১৪. তিনি ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন।

১৫. তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন।

১৬. কুরআন ২৩ বছর ধরে নাযিল হয়েছে।

১৭. তিনি ১৩ বছর মক্কায় এবং ১০ বছর মদিনায় দাওয়াত দেন।

১৮. তিনি ৫৩ বছর বয়সে মদিনায় হিজরত করেন।

১৯. প্রথম ওহি নাযিল হয় হেরা গুহায়।

২০. নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে প্রথম ওহি নিয়ে আসেন জিবরীল (আলাইহিস সালাম)।

২১. নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন খাদিজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)।

২২. সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নারী খাদিজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)।

২৩. সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ আবু বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

২৪. সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী শিশু আলী (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

২৫. সর্বপ্রথম শহীদ সুমাইয়া (রদিয়াল্লাহু আনহা)।

২৬. নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সর্বশেষ বিদায় হজ ১০ম হিজরিতে অনুষ্ঠিত হয়।

২৭. বিদায় হজে নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফার ময়দানে খুতবা দেন।

২৮. তিনি ১১ হিজরি সালে ইন্তিকাল করেন।

২৯. নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মদিনা মুনাওয়ারায় দাফন করা হয়।

৩০. নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর খলীফাতুর রছূল হিসেবে মুসলিমদের প্রথম খলীফা হন আবু বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

নোট/মন্তব্য:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহ

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
২. তা'লিমুত তাওহীদ
৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ
৪. ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
৫. রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত
৬. ইসলাম পালনের মূলনীতি
৭. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
৮. মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
৯. বিচার দিবস
১০. ইসলামে ব্যক্তিজীবন
১১. ইসলামে পারিবারিক জীবন
১২. ইসলামে সামাজিক জীবন
১৩. মুক্তির পয়গাম
১৪. তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
১৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
১৬. ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি
১৭. আল্লাহর পথের পথিক
১৮. গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
১৯. সীরতে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আরাবী ﷺ
২০. তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ
২১. আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই
২২. সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাহ
২৩. কিতাবুল উযহিয়্যাহ
২৪. তালিমুল আদাব (১ম ও ২য় পর্ব)
২৫. কিতাবুত তাজউইদ
২৬. ছোটদের আরকানুল ইসলাম

শেষ
প্রকাশনী